সবশেষে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সর্বত্রই শ্রমিকদের অধিকার নিয়ে যে আন্দোলন ক্রমশই স্বীকৃতি পাচ্ছে এবং উৎপাদনের পরিবেশ এবং শ্রমসম্পর্ক ও কর্মীদের জীবন ও ভবিষ্যতের নিরাপত্তা নিয়ে যে ধরনের চিন্তাভাবনা এখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—সেই পরিপ্রেক্ষিতেও মানবাধিকারের প্রসঙ্গে শ্রম-স্বার্থ একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিতে চলেছে।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে গৃহীত উদ্যোগসমূহ

মানবাধিকারের ক্ষেত্রে জাতিপুঞ্জ যেসব উদ্যোগ এ পর্যন্ত নিয়েছে সেগুলি মূলত এইসব বিষয়ের সঙ্গে জড়িত—যেমন অধিকারের ধারণা স্পষ্টীকরণ, এর প্রধান উপাদানগুলি চিহ্নিতকরণ, এবং সাধারণভাবে ও আলাদা আলাদাভাবে মানবাধিকার সম্পর্কে যে ঐকমত্য গড়ে উঠেছে সেগুলি আইনের ভাষায় লিপিবদ্ধ করে রাখা। নীচের তালিকা থেকে অনুমান করা যাবে এক্ষেত্রে কী ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ঃ

মানবাধিকার ঘোষণা (১৯৪৮), গণহত্যা বিরোধী চুক্তিপত্র (১৯৪৮), শিশুদের অধিকার ঘোষণা (১৯৫৯ ও ১৯৯১), সর্বত্র জাতিগত বৈষম্য দূরীকরণের পক্ষে ঘোষণা (১৯৬৩), উপনিবেশগুলিকে স্বাধীনতা দান বিষয়ক ঘোষণা (১৯৬০), নারীজাতির বিরুদ্ধে বৈষম্য দূরীকরণ বিষয়ক ঘোষণা (১৯৬৭), ব্যক্তি মানুষকে নিগ্রহ ও নৃশংস আচরণ এবং শাস্তি থেকে রক্ষার জন্য ঘোষণা (১৯৭৮), ধর্ম ও ধার্মিক বিশ্বাসের ভিত্তিতে সকল প্রকার অসহনীয়তা ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে ঘোষণা (১৯৮১), নারীদের অধিকার সম্বন্ধে বেইজিং ঘোষণা (১৯৯২)।

এছাড়া UN প্রথম দিকেই মানবাধিকার বিষয়ে দুটি চুক্তিপত্র রচনা করে (Conventions on Human Rights) যা ১৯৫৬ সালে গৃহীত হয় এবং ১৯৭০ সালে বিভিন্ন রাষ্ট্রের অনুমোদন লাভ করে।

একইসঙ্গে UN-এর তরফে কতকগুলি চালু প্রকল্প রয়েছে ঃ যেমন মানবাধিকার সংক্রান্ত বর্ষপঞ্জী, মানবাধিকার কমিশনের প্রতিবেদনসমূহ প্রকাশ, ECOSOC, UNESCO এবং ILO-তে গৃহীত প্রস্তাবসমূহের প্রচার। একাজে নাটকীয় চমক কিছু না থাকলেও গুরুত্ব কিছু কম নয়।

মানবাধিকার লঙ্ঘনজনিত সমস্যা ও তার প্রতিকার

অবশ্য মানবাধিকার সংরক্ষণের জন্য জাতিপুঞ্জের কার্যাবলী বিবিধ অন্তর্নিহিত সীমাবদ্ধতার মধ্য দিয়েই সম্পন্ন করতে হয়। প্রথমেই রয়েছে জাতিপুঞ্জে গৃহীত মূল নীতিসমূহের অন্যতম অভ্যন্তরীণ এক্তিয়ার বিষয়ক ২নং ধারার ৭নং অনুচ্ছেদ। এটি দুমুখো তরবারির মতো আসতে যেতে কাটে। একদিকে বারবার মানবাধিকার লঙ্ঘনের

দায়ে অভিযুক্ত রাষ্ট্রের ওপর কোনো বিধিনিষেধ আরোপ বা সামান্যতম শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে গেলেই অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের অভিযোগ ওঠে। অন্যদিকে যেসব দেশ মানবাধিকার সম্পর্কে একেবারেই উদাসীন, কিছু না করার জন্য এই অভ্যন্তরীণ এক্তিয়ারই তাদের বড়ো সাফাই হয়ে দাঁড়ায়। গণপ্রজাতন্ত্রী চীন ১৯৮৯ সালে তিয়েনানমেন চত্বরে বিক্ষোভ সমাবেশে ছাত্রদের বিরুদ্ধে যে বলপ্রয়োগ করে তার বিরুদ্ধে সমালোচনার ঝড় উঠলেও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া যায়নি। এ ব্যাপারে চীনের বক্তব্য তাদের দেশের মানুষ কতটা কী ভোগ করবে বা করবে না সেটা বাইরে থেকে কারোর ঠিক করে দেওয়ার ব্যাপার নয়। অনুরূপভাবে পাকিস্তানেও মোহাজি কাউমি আন্দোলনের ওপর পুলিশ ও সেনাবাহিনীর নিরন্তর নিগ্রহের প্রতিকার সম্ভব হচ্ছে না।

দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন দেশের সমাজব্যবস্থায় এত ফারাক এবং কোনো কোনো দেশের মতাদর্শগত অবস্থান এতই পৃথক যে কোন্‌টি অধিকার পদবাচ্য এবং কোন্ অধিকারটি কতটা অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য, তা নিয়ে বিতর্কের অন্ত নেই। সেখানে পশ্চিমি গণতান্ত্রিক দেশগুলির ঝোঁক রয়েছে রাজনৈতিক এবং পৌর অধিকার নিচয়ের ওপর (যেমন বাক্‌স্বাধীনতা, সংঘবদ্ধ হওয়ার স্বাধীনতা, প্রতিযোগিতামূলক দলবদ্ধতা, ভোটাধিকার ইত্যাদি) সেখানে অর্থনৈতিক অধিকারসমূহ (যেমন কর্মের অধিকার, বেকারভাতা, সামাজিক নিরাপত্তা ইত্যাদি)-কে গৌণ বলে মনে করা হয়ে থাকে। আবার সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহে (যদিও এখন তার সংখ্যা মুষ্টিমেয়) এই ঝোঁক সম্পূর্ণ বদলে যায়। সেখানে সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক অধিকার, কর্মীদের নিরাপত্তা সাধারণ অর্থে রাজনৈতিক স্বাধীনতাগুলির চেয়ে বেশি প্রাধান্য পেয়ে থাকে।

কিছু কিছু অধিকার যেমন নারীদের পুরুষদের সঙ্গে সমমর্যাদার অধিকারের কথা উঠলে রক্ষণশীল সমাজব্যবস্থা চঞ্চল হয়ে ওঠে। বিশেষ করে আজকের দিনে ইসলামপন্থী দুনিয়ায় এটা বেশি পরিমাণে দেখা যাচ্ছে।

এছাড়া বিভিন্ন অধিকার রূপায়ণে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সামর্থ্যও সমান নয়। অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার কারণেই অনেক দেশের কর্তৃস্থানীয় গোষ্ঠীর সদিচ্ছা সত্ত্বেও অনেক মৌল অর্থনৈতিক অধিকার কার্যকর হতে পারে না।

মূল্যায়ন

এসব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ মানবাধিকারের আদর্শকে সমুন্নত করে তোলার কাজে যথেষ্ট সক্রিয়া ভূমিকা নিতে পেরেছে। ১৯৪৮ সালে মানবাধিকার ঘোষণার পর ৩০টি ধারায় পৌর, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের এক ব্যাপক তালিকা স্থান পেয়েছে। সেটা আজও সারা পৃথিবীতে মানবাধিকার আন্দোলনের দিশারি রূপে গণ্য হয়ে থাকে। অনেক সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রের

সংবিধান রচনাকালে এই ঘোষণাপত্রটিকে ব্যাপকভাবে অনুসরণ করা হয় মানবাধিকার বিধিবদ্ধ করার প্রয়োজনে। অবশ্যই তৎকালীন দুই বিরুদ্ধবাদী মতাদর্শ—সমাজতন্ত্র ও ধনতন্ত্রের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য করেই এই ঘোষণাপত্রটি রচিত হয়েছিল। এমনকি সার্বভৌমত্বের সুবাদে প্রত্যেক রাষ্ট্রই তার অধীন ব্যক্তি মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতা খর্ব করার ক্ষমতা রাখে। সেজন্য নানা অজুহাতও (যেমন, নীতিবোধ, আইন-শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা রক্ষা ইত্যাদি) দেখাতে পারে। সেটাও ধরে নিয়েই এই ঘোষণাপত্র রচিত হয়েছে।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রতিষ্ঠান বিশেষ বিশেষ অধিকার ভঙ্গের ক্ষেত্রে যেসব প্রস্তাব গ্রহণ করেছে সেগুলিও মানবাধিকার আন্দোলনকে দৃঢ় হয়ে উঠতে সাহায্য করেছে। যেমন দক্ষিণ আফ্রিকা ও ইজরেয়ল এই দুটি দেশ জাতিপুঞ্জের বিভিন্ন মঞ্চে বার বার নিন্দিত হয়েছে—একটি তার বর্ণবৈষম্যের কারণে, অন্যটি তার অন্ধ আরববিদ্বেষ ও প্যালেস্তিনীয় মানুষের ওপর অন্যায় জুলুমের জন্য। এছাড়া, আফগানিস্তান, কামপুচিয়া, বর্মা, চিলি, সোমালিয়া কিংবা সার্বিয়াও রেহাই পায়নি। রাজনৈতিক বিরোধীদের ওপর তাদের নির্বিচার দমনপীড়ন সমালোচিত হয়েছে অতি তীব্র ভাষায়।

একথা বলা অসঙ্গত হবে না যে জাতিপুঞ্জে সাধারণ সভায় প্রবল জাতিবিদ্বেষ বিরোধী মনোভাবের প্রভাবেই হয়তো মার্কিন সরকারও ১৯৬৪ সালে পৌর স্বাধীনতার বিধি প্রবর্তন করেন, যাতে করে কৃষ্ণাঙ্গদের বিরুদ্ধে প্রচলিত বৈষম্য দূর করা যায়।

এটা সত্য কথা যে মানবাধিকার সংক্রান্ত দুই চুক্তিপত্র সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হতে দীর্ঘ সময় লেগেছে। ১৯৬৬ সালের আগে এগুলি অনুমোদন লাভ করেনি এবং প্রয়োজনীয় ৩৫ সদস্যের দ্বারা প্রত্যায়িত হতে ১৯৭৬ সালে পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল। এমনকি প্রত্যয়ণের পরেও তাদের দায়িত্ব শুধুমাত্র মহাসচিবের দপ্তরে বাৎসরিক একটি প্রতিবেদন পাঠানোতেই শেষ হয় যাতে বলা থাকবে মানবাধিকার রক্ষায় তারা কী কী ব্যবস্থা নিতে পেরেছে। আবার মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ সম্বলিত কিছু কিছু মামলা মানবাধিকার কমিটিতে উত্থাপিত হলেও কমিটির এক্তিয়ার এ ব্যাপারে নিতান্তই সীমাবদ্ধ। একমাত্র যেসব সদস্যরাষ্ট্র স্বেচ্ছায় এর এক্তিয়ার মেনে নিয়েছে তাদের বিরুদ্ধেই মানবাধিকার সংক্রান্ত মামলার শুনানী ঐ কমিটিতে হতে পারে। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে বিদ্যমান ব্যবস্থায় কমিটির ক্ষমতাকে খুবই ক্ষীণ করে রাখা হয়েছে। তা সত্ত্বেও এর বেশি আশা করা যায় না এই কারণে যে, বিশ্ব-আদালতকেও (ICJ) অনুরূপ সীমাবদ্ধতার মধ্যেই কাজ করতে হয়। জাতিপুঞ্জ বড়োজোর অভিযুক্ত রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় বসতে পারে

কিংবা তার বিরুদ্ধে নিন্দাসূচক প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারে। যেমন হয়েছিল বর্ণবৈষম্যবাদী দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের বিরুদ্ধে।

বরং তুলনামূলকভাবে বলা যায়, জাতিপুঞ্জের মানবাধিকার বিভাগের অধীন উদ্বাস্তু হাইকমিশন (UNHCR) অনেকবেশি কার্যক্ষম বলে প্রমাণিত হয়েছে। এই উদ্বাস্তু হাইকমিশনের দপ্তর ১৯৫৭ সালে সাধারণ সভার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে উদ্বাস্তুদের নানা সমস্যা সমাধানে এই দপ্তর প্রশংসনীয় উদ্যোগ নিয়েছে। প্যালেস্তিন, সোমালিয়া এবং প্রাচ্য দেশ থেকে উৎখাত হওয়া উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন এর অতি সাম্প্রতিক উদাহরণ। প্রসঙ্গত UNICEF-এর মাধ্যমে জাতিপুঞ্জ যে মানবিক সহায়সম্বল দানে ব্যাপৃত হয়েছে তার কাজও উল্লেখের দাবি রাখে। সম্পদের অপ্রতুলতা সত্ত্বেও UNICEF-এর তৎপরতা যথার্থই প্রসংশনীয় বলা চলে।

আবার জাতিপুঞ্জের প্রধান অঙ্গ হিসেবে মানবাধিকার রক্ষার কাজে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ যেসব মূল্যবান অনুসন্ধানমূলক প্রতিবেদন রচনা করে চলেছে—তার থেকে বিভিন্ন দেশে মানবাধিকার কোন্ স্তরে রয়েছে সে সম্বন্ধে এখন স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। যেমন দক্ষিণ আফ্রিকায় কালো-সাদার সম্পর্ক, দরিদ্র দেশগুলোতে শিশুদের স্বাভাবিক বিকাশের পথে অন্তরায় ইত্যাদি—সেগুলি কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। নারীদের সামাজিক মর্যাদা পর্যবেক্ষণের জন্য যে কমিশন অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ ১৯৪৬ সালেই স্থাপন করেছেন তাতে করে নারীদের আশু সমস্যাগুলি ক্রমশই নজর কাড়ছে। এর ফলে নারীদের বিরুদ্ধে বৈষম্য ও নির্যাতনের ঘটনাগুলি এখন সমালোচনার বাইরে থাকতে পারছে না। ক্রমে ক্রমে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যাপারে নারীদের ক্ষমতা প্রদানের কাজটাও এর ফলে সহজ হয়ে উঠেছে। ১৯৯২ সালে বেইজিং-এ অনুষ্ঠিত বিশ্বনারী সম্মেলন এই প্রক্রিয়ারই চূড়ান্ত প্রকাশ।